বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২ - ১৭৬০)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য কবি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। তাঁর সবচাইতে প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী রচনা 'অন্নদামঙ্গল' বা 'নূতনমঙ্গল কাব্য'। 'অন্নদামঙ্গলকাব্যের' তিনটি খন্ড। (ক) 'অন্নদামঙ্গল', (খ) 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' এবং (গ) 'অন্নপূর্ণা মঙ্গল' বা 'মানসিংহ'। হাওড়ার পেঁড়ো - ভুরশুট গ্রামে জন্ম। হুগলীতে পড়াশুনা। সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন। পরে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমন্ত্রণে রাজসভার কবি। 'রসমঞ্জরী', 'গঙ্গাস্তোক', 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী', 'চন্ডী' নাটক তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা। আধুনিক বাংলা সঙ্গীতেরও তিনি পুরোধা। 'মঙ্গলগান' ও 'পদাবলীকীর্তন' নিয়ে তিনি অনেক কাজ করে গেছেন। তাঁর জন্মের ত্রিশতবর্ষে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২ - ১৮৬৯)

গুপ্তকবি নামেই বেশী পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে মধুসুদন পূর্ব যুগের প্রধান কবি। কাব্যিক ছন্দে অসামান্য দখল। পাশাপাশি স্বনামধন্য সম্পাদক। 'সংবাদ প্রভাকর' সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। তাঁর মূল কৃতিত্ব আদিরসাত্মক খেউর থেকে বাংলা কবিতাকে নতুন ভাষা প্রদান। চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন হিন্দু রক্ষণশীল। তদানীন্তন 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, চব্বিশ পরগণার কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর জন্ম এবং কলকাতায় শিক্ষা ও কর্মজীবন। তাঁর জন্মের দ্বিশতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উপেন্দ্র কিশোর রায়-চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)

শিশু সাহিত্যের মণিমুক্তো থেকে বহুমুখী মুদ্রণ শিল্প, ক্রিকেট থেকে হাস্যকৌতুক - অভিনয়, গানবাজনা থেকে চলচ্চিত্র — বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনাকে আন্তর্জাতিক মানে তুলে ধরার জন্য বাঙালী জাতি কামদারঞ্জন, সারদারঞ্জন, কুলদাররঞ্জন থেকে সুখলতা, সুকুমার, পুণ্যলতা, লীলা, কণক, নলিনী, সত্যজিৎ, সন্দীপ, ময়মন সিংহের, পরবর্তীতে কলকাতার গড়পারের, রায় পরিবারের অপরিসীম অবদানকে কখনই ভুলবে না। এই বহুমুখী প্রতিভাধর পরিবারের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনে লাভের দিকে না তাকিয়ে তিনি শুধু কাজ করে গেছেন। হাফটোন ছবি মুদ্রণ, বিভিন্ন ধরনের ব্লক তৈরী, ক্রশ লাইন স্ক্রিন সহ মুদ্রণ শিল্পের কারিগরি দিকে তিনি ছিলেন একজন আর্ন্তজাতিক পথিকৃৎ। দক্ষিণ এশিয়ায় তিনিই প্রথম মুদ্রণ প্রেস স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম সমাজ ও সামাজিক আন্দোলনের তিনি একজন নীরব কর্মবীর। শত সমস্যার মধ্যেও নিজে যেমন আনন্দময় থাকতেন অন্যদেরও আনন্দে রাখতেন। বিশেষত কচিকাঁচাদের সাথে ছিল তাঁর অতি গভীর সখ্যতা। ওদের ভুলিয়ে ও খুশী রাখতে কত যে মন ভোলানো গল্প, ছড়া, ছবি, গান, কল্পকাহিনী, অলংকরণ, পুরাণ-বৃত্তান্ত, উপকথা, জীবজন্তুর কথা, প্রকৃতি ও নভোমন্ডলের গল্প, ভ্রমণ কাহিনী সৃষ্টি ও সংগ্রহ করেছিলেন তার হিসেব নেই। তাঁর সৃষ্ট 'টুনটুনির বই', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'ছোট্ট রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'সেকালের কথা', আর 'আকাশের কথা' চিরকালীন ক্লাসিক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকা যুগ যুগ ধরে পাঠকের মন কাড়ে। এছাড়াওতিনি ছিলেন একজন দক্ষ বেহালা বাদক, স্বরলিপির প্রবর্তক ও উদ্যোগপতি। রবীন্দ্রনাথ সহ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাথে যৌথ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলার নবজাগরণের এই কৃতী পুরোধার সার্ধ শতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪ - ১৯২৪)

সারা ভারত বাংলাব তিন শার্দুলকে চেনে। সুন্দরবনের বিশ্ববিখ্যাত 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার', বিপ্লবী বাঘা যতীন আর 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ। আদিবাড়ি হুগলী। কলকাতার ভবানীপুরের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের মেধাবী সন্তান আশুতোষ বিদ্যালয়ের শুরু থেকে প্রেসিডেন্সী মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠক্রম থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. তে উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সব সময়েই প্রথম স্থানাধিকারী। তিনিই প্রথম দুই বিষয়ে এম. এ. (গণিত ও পদার্থবিদ্যা), আইনের স্নাতক পরীক্ষাতেও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। এছাড়া 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' সম্মান সহ বহু সম্মানে ভূষিত। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে তাঁর রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি থেকে গণিত সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রশাসক বহু গুরু দায়িত্ব তিনি তাঁর প্রখর মেধা, তেজস্বী ব্যক্তিত্ব, চওড়া ছাতি আর বৃষ-স্কন্ধের সমাহারে কৃতিত্বের সাথে সামলেছেন।

এর মধ্যে দুটি পর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য পদে দীর্ঘদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সংস্কার করেন, বহু বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন চালু করেন। সি. ভি. রমন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ সারা ভারত থেকে সেরা শিক্ষাবিদদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। প্রয়োজনে ইংরেজ শাসকদের সাথে যুক্তি তর্কের লড়াই চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজগুলি আদায় করে নিতেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে থেকেই তিনি সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন স্যার উপাধি। জননেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়রা তাঁর যোগ্য বংশধর। তাঁর সার্ধ শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জাদুকর পি. সি. সরকার সিনিয়র (১৯১৩ - ১৯৭১)

অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইলের এক প্রসিদ্ধ জাদুকর পরিবারে প্রতুলচন্দ্রের জন্ম। প্রপ্রপিতামহ রমাকান্ত, প্রপিতামহ দ্বারকানাথ, পিতা ভগবানচন্দ্র ভাল জাদুবিদ্যা জানলেও সেই সময়কার কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, আরও পশ্চাদপদ পরিস্থিতিতে সামাজিকভাবে জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করা যেত না। 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনে অনুপ্রাণিত ভগবানচন্দ্র 'জাতীয় মেলা' প্রভৃতিতে যাদু দেখিয়েও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাননি। এই ঘটনাগুলি প্রতুলচন্দ্রকে জেদী করে তোলে। পারিবারিক আপত্তি সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করে তিনি নিজেকে খ্যাতিমান জাদুকর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশে গণপতি চক্রবর্তী, যতীন সাহাদের মত নামী জাদুকর এবং আর্ন্তজাতিক মহলে হুডিনিদের মত প্রতিভাবান জাদুকররা স্বমহিমায় বিরাজ করলেও দেশে বিদেশে 'পি সি সরকারে'র চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী ভারতীয় জাদুবিদ্যার সাথে আধুনিক প্রযুক্তির চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়ে ছিলেন এবং অসম্ভব সব চমকে দেওয়া ও আকর্ষণীয় খেলা আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে তাঁর প্রদর্শনীর নামকরণ করেছিলেন 'ইন্দ্রজাল'। জাদু প্রদর্শনের সাথে জমকালো পোশাক, আবহসঙ্গীত, মুডলাইট, প্রজেকশন প্রভৃতির সমাহার ঘটিয়ে দর্শনসুখকে এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। 'জাদুসম্রাট', 'পদ্মশ্রী', 'দ্য স্ফিংস অস্কার' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 'দ্য রয়্যাল মেডেলিয়ান' (জার্মানী) প্রভৃতি দেশে বিদেশের নানা উপাধি পান। জাদু প্রদর্শনকালে জাপানে তাঁর মৃত্যু হয়। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন প্রবন্ধকার। 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'ক্যালকাটা রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা বের হত। তাঁর পুত্র প্রদীপ চন্দ্র, পুত্রবধূ জয়শ্রী, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভাসচন্দ্র, পৌত্রী মানেকা সহ পরিবারের অনেকেই জাদুবিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে সফল হয়েছেন। জেষ্ঠপুত্র মানিক একজন খ্যাতিমান লেজার ও অ্যানিমেশন শিল্পী। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

অজয় হোম (১৯১৩ - ১৯৯২)

উত্তর কলকাতার বনেদী বাড়ির কৃতী সন্তান অজয় হোম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। একসাথে ভাল ক্রিকেটার,দুঁদে ব্রিজ প্লেয়ার, লেখক, সাংবাদিক, গায়ক, চিত্র সমালোচক, সম্পাদক ('ছায়াপথ', 'প্রকৃতিজ্ঞান'), বিজ্ঞানকর্মী, প্রকৃতি সংসদ নামক প্রকৃতিচর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে' গ্রন্থগারিক এবং বিখ্যাত পক্ষী বিশারদ। তাঁর রচিত 'বাংলার পাখি' ও 'চেনা অচেনা পাখি' পক্ষীচর্চ্চার দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪ - ১৯৫১)

" তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনে সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না, ।..... " অবিভক্ত বাংলার তিতাস নদী পাড়ের মালো জীবনের বারমাস্যা জলছবি সুমধুর শব্দ ঝঙ্কারে লেখা এক মহা কাব্যিক উপন্যাস অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বিশ্ব সাহিত্যের একটি অমূল্য ক্লাসিক। পরবর্তিতে ভগ্ন মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের আলো আঁধারিতে স্থানীয় অনামী শিল্পীদের নিয়ে কিংবদন্তী চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক তিতাসের কাহিনী নিয়ে তৈরী করলেন এক অপূর্ব চলচ্চিত্র ক্লাসিক। কুমিল্লার দরিদ্র মালোর সন্তান অদ্বৈত খুব কষ্ট করে পড়াশুনা করেন। তারপর সাংবাদিকতা ও সম্পাদনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে 'নবশক্তি', 'আজাদ', 'মোহম্মদী', 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেন। দারিদ্র ও অর্থকষ্ট ছিল তার নিত্যসঙ্গী। তার উপর দেশ ভাগের যন্ত্রণা এবং ছিন্নমূল বিশাল পরিবারের ভরণপোষণের দায়ভার তাঁকে শারীরিকভাবে নিঃশোষিত করে দেয়। তাঁর যক্ষ্মায় অকালমৃত্যু ঘটে। বেশি লেখার তিনি সময় সুযোগ পান নি, কিন্তু তারই মধ্যে শাহী মেজাজে লিখে গেছেন তিতাসের অমর কাহিনী যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

এছাড়াও রামতনু লাহিড়ি, প্যারী চাঁদ মিত্র প্রমুখের জন্মের দ্বিশতবর্ষে; রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের জন্মের সার্ধ শতবর্ষে এবং সুশীল মুখোপাধ্যায়, অজয় কর, সাধনা বসু, চিন্মোহন সেহানবিশ প্রমুখের জন্ম শতবর্ষে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

বিপ্লবী কল্পনা দত্ত (১৯১৩-১৯৯৫)

বিয়ের বেনারসিটি যিনি লাল পতাকা তৈরীর কাজে লাগান, প্রথম পুত্র জন্মাবার পর আত্মীয়র পাঠানো গয়না জমা দেন পার্টি ফান্ডে। তিনি হলেন মাষ্টারদা সূর্য সেনের হাতে গড়া 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি', চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চের বিশ্বস্ত সৈনিক বিপ্লবী কল্পনা দত্ত। চট্টগ্রামে জন্ম, ম্যাট্রিকুলেশন করে কলকাতায় বেথুন কলেজে বিজ্ঞান শাখা ভর্তি হয়ে 'ছাত্রী সঙ্গে' যোগ দেন। ১৯৩০ এ চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে অংশ নেন। '৩১এ ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের রেকি করার সময় ধরা পড়েন। পরে জামিন ভেঙ্গে পালান। '৩৩এ পুলিশের ঘেরাটোপ ভেঙ্গে বেশ কয়েকবার পালালেও পরে ধরা পড়েন। ব্রিটিশ সরকার যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেন। পরে '৩৯ এ মুক্তি পান। '৪০এ স্নাতক হন। '৪৫এ কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণ চাঁদ যোশির সাথে বিয়ে হয়। তাঁর দুই পুত্রের একজন চাঁদ ও পুত্রবধূ মানীনী বিশিষ্ট সাংবাদিক।

বিশিষ্ট যুক্তিবাদী, কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞান আন্দোলনের সংগঠক ডাঃ নরেন্দ্র দাভলকারকে হত্যার তীব্র প্রতিবাদএবং ষড়যন্ত্রকারী ও হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবী জানাই।

কাস্তে কবি দীনেশ দাস (১৯১৩ - ১৯৮৫)

'বেয়নেট হ'ক যত ধারালো কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!
বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো, এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে!...'

কলকাতার আলিপুরের মামা বাড়িতে জন্ম। ১৫ বছর বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ। মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান। কবিতা ছাপা হতে থাকে বিভিন্ন পত্রিকায়। খার্সিয়াঙে চা বাগানে কাজ নিয়ে যান। গান্ধীবাদে মোহভঙ্গ, মার্কর্সবাদে আকর্ষণ। ১৯৩৭ এ লেখেন বিখ্যাত কবিতা 'কাস্তে'। চেতলা বয়েজ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। নামকরা কাব্যগ্রন্থ : 'ভূখমিছিল', 'কাচের মানুষ', 'রাম গেছে বনবাসে', 'কাস্তে'। সত্তর দশকে লেখেন গভীর মর্মস্পর্শী সব লাইন :

'...ছেলে দুটো মিশে গেছে গহন গভীর বনে, কে তাদের খুঁজে পাবে?
অযোধ্যাবাসীরা সব বৃথা খুঁজে মরে, ছেলেরা হারিয়ে গেছে গাছ হয়ে বনের হৃদয়ে।

সকলের মনে হয় তারাও হারিয়ে গেছে—
অরণ্যের অন্ধকারে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, আমরাও গাছ হব, গাছ হব।'

বিশিষ্ট চিত্রকর শানু লাহিড়ী, নাট্যকার ও অভিনেতা ইন্দ্রাশিষ লাহিড়ি, গায়ক প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, সনৎ সিংহ, বন্দনা সিংহ ও মৃণাল বন্দোপাধ্যায়, প্রাক্তন রাজ্যপাল বীরেন্দ্র জে. শাহ্, বাংলাদেশের প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা ও রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান, শাহ্বাগ শহীদ রাজীব হায়দর; গঙ্গাপরিষ্কার আন্দোলনের কর্ণধার বীরভদ্র সিংহ, ছাত্র নেতা সুদীপ্ত গুপ্ত, ইতিহাসবিদ্ বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তথ্যজানার অধিকার আন্দোলনের পুরোধা রামকুমার ঠাকুর, বিশিষ্ট নেত্রী নিবেদিতা নাগ, চিত্রনাট্য লেখিকা রুথ প্রায়ার জাভালা, 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা সাধনা মুখোপাধ্যায়, 'বেলুর শ্রমজীবী হাসপাতালে'র ডাঃ কল্যাণ ও ডাঃ মালবিকা বিশ্বাস, তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ অতুল চিটনিস, স্কটিশ সাহিত্যিক আইয়ান ব্যাঙ্ক, ব্রিটেনের দীর্ঘতম ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার, গণিতজ্ঞা শকুন্তলা দেবী, সঙ্গীতকার পি. শ্রী নিবাস, বেহালাবাদক এল. জয়রামণ, পোলিও টীকার অন্যতম জনক কোপারস্কি, বিচারপতি জে. এস. ভার্মা, সঙ্গীতকার সামসাদ বেগম, পাঞ্জাবের নেতা সতপাল ডাং, বিজ্ঞান লেখক সমরজিৎ কর, সেবিকা ও সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা বিষ্ণুপ্রাণা, লেখক সরোজ বন্দোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার, সমাজতান্ত্রিক শর্মিলা রেগে, সঙ্গীতকার টি. এম. সৌন্দররাজন, ঐতিহাসিক বরুণ দে, লীলা এলউইন, সর্বকালের সেরা রাইট ব্যাক জালমা স্যান্টোস, সামরিক বিশেষজ্ঞ যশজিৎ সিং, আইরিশ কবি সীমাস হিনি, সঙ্গীতকার রঘুনাথ মিশ্র প্রমুখের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। এঁদের প্রতি জানাই শ্রদ্ধা এবং এঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা।

- দিল্লী, বারাসাত, পাকুড়, মুম্বাই সহ দেশের সর্বত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষত মহিলাদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান নির্যাতন প্রতিরোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। অপরাধীদের দ্রুত দৃষ্টান্ত মূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং গণমাধ্যমে নারীকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করতে হবে।
- মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে উল্কাগতির দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। অতি মুনাফাকারী, কালোবাজারী, অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে।
- বেকার যুবক ও যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতিগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করে নির্দ্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এরপর কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন প্রমুখ। এই সব বাঙালী মনিষীগণ জগৎসভায় বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সেই সময়কার শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত রাজ-দেওয়ান পরিবারের সন্তান দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগর থেকে এন্ট্রাস ও এফ. এ., হুগলীর মহসীন কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. পাশ করে ২১ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে কৃষিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষালাভে যান। দ্বিজেন্দ্রলালের বাবা ছিলেন কবি এবং তাঁর পুত্র বিশিষ্ট সঙ্গীতকার ও দার্শনিক দিলীপ কুমার রায়। ইংল্যান্ডে তিন বছর কৃষিবিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী ভাষা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দেশে ফিরে সরকারী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে যান। সেইসময় দ্বিজেন্দ্রলাল এক অদ্ভুত জটিল পরিস্থিতিতে পড়েন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে কালাপানি পার ও ম্লেচ্ছ সংসর্গের দায়ে অভিযুক্ত হন। অন্যদিকে ইংরেজসেবক ধর্মান্তরিত কালাসাহেব হতে না পারার জন্য ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে হেনস্থাও হতে হয় তাঁকে। তার উপর ধারাবাহিক অসুস্থতা। কিন্তু তাঁর দেশকে দেখা, দেশবাসীকে জানা ও দেশপ্রেমকে কোন কিছু টলাতে পারেনি। কিছুদিন পর তিনি লোভনীয় সরকারী চাকরী ছেড়ে সাহিত্য সেবায় মনোনিয়োগ করেন। তারপর তাঁর শক্তিধর লেখনী থেকে জন্ম নিতে থাকে দেশপ্রেমে সিক্ত অপূর্ব সব গান, নাটক, প্রহসন যেগুলি কিনা চিরকালই বাঙালীর গৌরব। তাঁর জন্মের সার্ধ শতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

বাবা আলাউদ্দীন খাঁ

ভারতীয় শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতের সাধনায় এক বিরল প্রতিভাবান সন্ন্যাসী যিনি সৃষ্টি করেছিলেন 'সেনিয়া মাইহার' সঙ্গীত ঘরানা, গড়ে তোলেন 'মাইহার ব্যান্ড', পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় যন্ত্র সঙ্গীত। তৈরী করেন বিশ্বের সেরা সরোদ বাদক আলি আকবর খাঁন, সেরা সেতার বাদক রবিশঙ্কর এবং সেরা সুরবাহার বাদক অন্নপূর্ণা দেবীর মত বিশ্ববরেণ্য শিষ্য-শিষ্যা। যিনি দু'হাতে প্রায় সব রকম যন্ত্র বাজাতে পারতেন — তিনি হলেন কিংবদন্তী যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক 'বাবা' আলাউদ্দীন খাঁ। কুমিল্লায় অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম। বারবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে খুব কষ্ট করে গান বাজনা শেখেন। গ্রামের লোক শিল্পীদের কাছ থেকে লোকসঙ্গীত, 'নুলো গোপালে'র কাছে ধ্রুপদ, অমৃতলাল দত্তের কাছে পাশ্চাত্য যন্ত্র সঙ্গীত ...। কৃতী বাজনাদার হয়ে উঠে মধ্য প্রদেশের মাইহার রাজার আহ্বানে মাইহারে আশ্রম গড়েন। উদয় শঙ্করের ব্যালে গ্রুপের সাথে ইউরোপ ভ্রমণ করেন। পরে শত আমন্ত্রণ ও প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি মাইহার ছাড়েন নি। অনাড়ম্বর সরল জীবন যাত্রায় কঠোর তালিম দিয়ে তৈরী করেন তিমিরবরণ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহাদুর খাঁ, প্রমুখদের মত যশস্বী শিল্পীদের। 'বাবা' আলাউদ্দীন খাঁ জন্ম সার্ধশতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

মানুষরতন নীলরতন

পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কিছু মানুষ এসেছেন যাদের নীরব বৃহত্তর কর্মোদ্যোগ সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এমনই একজন মানুষরতন নীলরতন অর্থাৎ গত শতাব্দীর 'ধন্বন্তরি' চিকিৎসক ডা: নীলরতন সরকার। গ্রামের দরিদ্র পারিবারের সন্তান ব্রিটিশ সাহেবদের মেডিকেল কলেজ থেকে কিভাবে ডাক্তার হলেন এটি একটি গল্প হতে পারত। দরিদ্র থেকে ধনী, অনামী থেকে নামীদের চিকিৎসা করে কিভাবে নিরাময় করেছেন বা জীবন দিয়েছেন তা নিয়ে অনেক অনেক গল্প হতে পারত। ডা: নীলরতন সরকারের কাজের পরিধি আরও অনেক ব্যাপ্ত ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের বাধা পেরিয়ে বহুকষ্টে ভারতীয় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, 'বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটে'র প্রতিষ্ঠা, 'বিশ্বভারতী'র ট্রাস্টি প্রধান, 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'র সভাপতি, শিক্ষক, পরিচালক ইত্যাদি অসংখ্য কর্মকান্ডে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের পরম বান্ধব ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ হিতৈষী। এত কাজের পরেও তিনি দেশাত্মবোধক কাজে এবং 'জাতীয় কংগ্রেসে'র সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সার্ধশতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়

ব্রিটিশ পুলিশের এক ভারতীয় অফিসারের সন্তান ভবানী চরণ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬১-এর হুগলীর এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে শিক্ষালাভ করেন, পাশাপাশি সংস্কৃত অধ্যয়ন করে ভারতীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতি-ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। এরপর তিনি অবিভক্ত ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজসেবার কাজ শুরু করেন। ক্রমে জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হন এবং কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং কংগ্রেস বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সেইসময় কাকা, স্বাধীনতা সংগ্রামী, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নতুন নামকরণ হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি নিরলসভাবে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ প্রচারে অবতীর্ণ হন। 'The Harmony' ইংরেজী মাসিক পত্রিকা এবং বাংলায় দৈনিক পত্রিকা 'সন্ধ্যা' প্রকাশ করতে শুরু করেন। এছাড়াও 'সারস্বত আয়তন' নামে একটি বিদ্যালয় চালাতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী, স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সার্ধ শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

বাংলার এই বিদুষিণী বীরাঙ্গনা ১৯১১ সালে অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা প্রথমে চট্টগ্রামের খাস্তগীর হাইস্কুল থেকে প্রথম ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেন, তারপর ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাজ্যে প্রথম হন, তারপর কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে ফিলজফিতে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থায় ঢাকা ও কলকাতায় প্রীতিলতা ব্রিটিশ বিরোধী গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। এরপর চট্টগ্রামের একটি মাধ্যমিক ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার চাকরি নেন। পাশাপাশি চলতে থাকে বিপ্লবী সাংগঠনের কাজ। ১৯৩০ এ মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস, জালালাবাদ পাহাড়ের ঐতিহাসিক যুদ্ধ, ধলঘাটের লড়াই সহ ব্রিটিশের সাথে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষে যুক্ত হন। মাঝে গোপনে কলকাতার বিপ্লবী ও প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী বিপ্লবীদের সাথে দেখা করে যান। পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড়ে তিনি, কল্পনা দত্ত প্রমুখ মহিলা বিপ্লবীরাও আত্মগোপন করেন। এরপর ১৯৩২ এ অত্যাচারী ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারদের হত্যা করতে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। সফল অপারেশনের পর আহত হয়ে ধরা পড়ার ভয়ে আত্মহত্যা করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১। এই বিপ্লবী বীরাঙ্গনার জন্ম শতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

অক্ষয় কুমার মৈত্র

অক্ষয় কুমার মৈত্র অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে আইন চর্চা শুরু করলেও তাঁর প্রধান উৎসাহ ছিল বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে। দুটি বিষয়েই তিনি প্রচুর লেখালেখি করেন। এরপর শুরু করেন ইতিহাস নিয়ে চর্চা। ইতিহাস রচনায় তথ্য ও বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'পাল রাজবংশ', 'সিরাজৌদ্দোলাহ্', 'মীরকাশিম', 'সমরসিংহ', 'সীতারাম রায়', 'ফিরিঙ্গি বণিক' তাঁর বিখ্যাত সব লেখা। বিজ্ঞান চর্চ্চাতেও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তার সার্ধ শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

চুনীলাল বসু

ডা: চুনীলাল বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে মেডিসিন ও সার্জারিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর আসল কৃতিত্ব ছিল রসায়ন শাস্ত্রে অসীম দক্ষতা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে তিনি প্রথম ভারতীয় মুখ্য রসায়ণবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রসায়ণ শাস্ত্রের অধ্যাপক। খাদ্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ, পুষ্টি ও অপুষ্টির কারণ নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক ও জাতীয় সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারে প্রয়াসী হন। তাঁর সার্ধ শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

উস্তাদ আমীর খাঁ

হিন্দুস্তানী কণ্ঠসঙ্গীত জগতের দিকপাল গায়ক আমীর খাঁ ইন্দোরে এক সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরদা ছিলেন বাদশা বাহাদুর শাহ্ জাফরের দরবারের গায়ক, বাবা হোলকার রাজ দরবারের সারেঙ্গি ও বীণাবাদক এবং সহোদর ভাইও আকাশবাণীর সারেঙ্গি বাদক। খাঁ সাহেব প্রথমে সারেঙ্গি ও তবলাতে দক্ষতা অর্জন করেন, তারপর বাড়িতে অনবরত অনুষ্ঠিত মেহফিলগুলি থেকে কণ্ঠসঙ্গীত শিখতে থাকেন। পরে ইন্দোর

ঘরানার মেরুখণ্ড শাখার বিখ্যাত উস্তাদদের কাছে শিখে নিজের এক অনবদ্য গায়কী গড়ে তোলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, সরগম, তান ও তারানার মোহবিস্তার করে তিনি শ্রোতাদের আপ্লুত করে দিতেন। সেই সময়কার দুই ধরণের গায়কীর দুই সর্বোচ্চ কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন বড়ে গোলাম আলি ও আমীর খাঁ সাহেব। প্রথমে বম্বে, তারপর মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, কলকাতা, সবশেষে আবার বম্বেতে খাঁ সাহেব কর্মসূত্রে কাটান। মঞ্চ আলোকিত করার পাশাপাশি তাঁর প্রচুর গানের রেকর্ড হয়। বৈজু বাওড়া, ক্ষুধিত পাষাণ, গালিব প্রভৃতি বিখ্যাত চলচ্চিত্র কণ্ঠ দান করেন। তিনি অনেক কৃতী ছাত্র গড়ে তুলেছিলেন। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, পদ্মভূষণ পুরস্কার পান। ১৯৭৪ এ এক অনুষ্ঠান সেরে ফেরার সময় গাড়ি দুর্ঘটনায় কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকিতে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

নটী বিনোদিনী

নিম্ন জাতের দরিদ্র পরিবারে জন্ম বিনোদিনী দুর্বিপাকে পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন। পরে সেইসময়কার নটসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁকে নাটকের অভিনয়ে নিয়ে আসেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইওরোপীয় প্রভাবে উত্তর কলকাতার অনুপস্থিত জমিদার, আড়তদার, পাটোয়ারি ধনী বাবুদের মধ্যে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঝোঁক চাপে। ১৮৭৪ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে বিনোদিনী দাসী ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেই সাড়া ফেলে দেন। তারপর পরবর্তী বারো বছর ধরে আশিটি নাটকে দাপটের সাথে অভিনয় করে মঞ্চ সম্রাজ্ঞী নটী বিনোদিনী হয়ে ওঠেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্য্যন্ত তাঁর অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। খ্যাতির শীর্ষে আচমকাই অভিনয় ছেড়ে দেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম অভিনেত্রী যিনি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তাঁর সার্ধ শতবার্ষিকিতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

রাধানাথ শিকদার

পিতা তিতুরামের কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে বাবু রাধানাথ শিকদার জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনা 'ফিরিঙ্গি' কমল বোসের স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে)। তিনি ছিলেন অধ্যাপক লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র শিষ্য এবং চরম সংস্কারবাদী 'ইয়াং বেঙ্গল' দলের সদস্য। প্যারিচাঁদ মিত্রের সাথে শিক্ষা ও নারী সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে ১৮৬৪ সালে 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করতে শুরু করেন। গণিতে, বিশেষ করে ভূ-ত্রিকোণমিতিতে, তাঁর প্রবল বুৎপত্তি ছিল। ঔপনিবেশিক ভারত সরকারের সার্ভে বিভাগে উচ্চপদে আসীন থেকে দেরাদুন থেকে দার্জিলিঙ-এ দীর্ঘ কর্মজীবন কাটান। সেই সময় 'গ্রেট ট্রিগোনোমেটরিক সার্ভে'তে সক্রিয় অংশ নেন। তিনি প্রথম অঙ্ক কষে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 'পিক ১৫'-র, পরবর্তিতে যার নামকরণ হয় 'মাউন্ট এভারেস্ট', উচ্চতা নির্ধারণ করেন। জন্মের দ্বি শতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

- 'টুজি', 'কয়লাগেট' প্রভৃতি কেলেঙ্কারীর এবং ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে।
- জেভিয়ার ডায়াস, ডা: সুনীলম, সোনি সোরি, সীমা আজাদ, ইরম শর্মিলা, কুডানকুলামের প্রতিবাদী মৎস্যজীবী সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারী ও মানবাধিকারকর্মীদের পুলিশি ও সশস্ত্র বাহিনীর নির্যাতন এবং জেল-বন্দীত্ব-মামলা থেকে মুক্তি দিতে হবে।
- নোয়ামুণ্ডি, নাগরি, সিঙ্গুর, মাথাভাঙ্গা, জইতাপুর, নোনাডাঙ্গা, কুডানকুলাম, লোবা, তেহট্ট প্রতিটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।
- বরানগর - কাশীপুর, ভোপাল, মরিচঝাঁপি, বাথানিটোলা, নেলি, গোধরা, করন্দা, নন্দীগ্রাম, ভাট্টাপারসল, দিসপুর, নেতাই প্রতিটি গণহত্যার দ্রুত তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- চা-বাগান সহ পশ্চাদপর আদিবাসী এলাকায় অনাহারে মৃত্যু প্রতিরোধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- কোকরাঝাড় সহ নমনি অসমে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।
- তামিলনাড়ুর ধরমপুরি সহ দেশ জুড়ে দলিত গরীব ভূমিহীন কৃষকদের উপর উচ্চ ও মধ্য বর্ণের ভূস্বামীদের অত্যাচার বন্ধ করতে সরকারকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ভারতীয় কালো টাকা উদ্ধার এবং রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্কের ঋণ খেলাপি শিল্পপতিদের জরিমানা সহ সম্পত্তি ক্রোক করতে হবে।
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সিরিয়া ও গাজায় গণহত্যা এবং সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্ত, ইরাণ, কঙ্গো, মালি, দক্ষিণ সুদান — সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।
- কুডানকুলাম সহ মারণঘাতী পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করতে হবে।

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু ভাষাবিদ রেভারেন্ড **কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮১৩-১৮৮৫) ছিলেন **'ভারত সভা'**র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি; ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার **'নবজাগরণে'**র অন্যতম প্রাণপুরুষ এবং ডিরোজিও প্রবর্তিত 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক। তিনি সারাজীবন শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ প্রভৃতির জন্য কাজ করে গেছেন। ১৩ খণ্ড বিশিষ্ট 'এনসাইক্লোপেডিয়া বেঙ্গলিনস (বিদ্যা কল্পদ্রুম)' রচনায় তাঁর ছিল গুরুত্বপূর্ণ অবদান। 'দি পারসিকিউটেড' তাঁর রচিত ইংরেজি নাটকটিও সাড়া ফেলেছিল। তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান লিগ প্রভৃতি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর জন্ম দ্বিশতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ব ও ভারতকে তিনি তাঁর শান্তির নিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর সমৃদ্ধিশীল ভারতীয় ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যময় বাংলার প্রাণকে তিনি কাব্য, গল্প, গীতি, নাট্য, নৃত্যনাট্য, অঙ্কন, উপন্যাস, প্রবন্ধ বহুবিধ রূপরসের অরূপ বাণীর মাধ্যমে আবিশ্ব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অনন্য প্রতিভাধর মনন প্রকৃতি সংরক্ষণ, সার্বিক শিক্ষা, শিশুশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষক সমবায়, দেশাত্মবোধ, পল্লী গঠন, জাতীয় সংহতি, উন্নয়ন, বিশ্বভাবনা ও মুক্তির পথের সাধনায় ব্যাপৃত ছিল। যৌবনকালে শিলাইদহে কীর্তিনাশা পদ্মার উথাল পাতাল স্রোত, বর্ষণসিক্ত কৃষিভিত্তিক উর্বর পূর্ববাংলার শ্যামল শোভন গ্রাম জীবন তাঁকে বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সব সৃষ্টি করতে প্রাণিত করেছে। ব্রহ্মসঙ্গীত থেকে কীর্তনাঙ্গন, লালনগীতি থেকে বাউলরীতি তাঁর সৃজনকে করেছে সংপৃক্ত। সায়াহ্নে রাঢ় বাংলার বর্ণময় ঋতুভরী প্রকৃতি ও জীবন বৈচিত্র্য তাঁকে জুগিয়ে গেছে প্রেরণা। তাঁর দীর্ঘজীবন সঞ্চিত রেনেসাঁসলব্ধ জোড়াসাঁকোর পরিবার - পরিবেশ, বিশ্বভ্রমণ বীক্ষা সহ বিবিধ অন্বেষণ জাত জ্ঞানধারার উন্মেষ মহীরূহের মত জাতির চিন্তা চেতনায় এক স্নিগ্ধ ছায়া সহ আনন্দ প্রবাহের সঞ্চার করেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসার্ধশতবর্ষে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্বামী বিবেকানন্দ

ধর্মকে তিনি কর্মে স্থাপন করেছিলেন। জীবে প্রেম ও সেবার মাধ্যমে তিঁনি ঈশ্বর সেবার আহবান রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের লোকায়ত দর্শনের স্পর্শে সিমলার দুর্জয় নরেন্দ্রনাথ পেলেন বিবেকের আনন্দ, বীর্যের মাধুকরী। পরিব্রাজকের জীবন বেছে নিলেন দেশ ও জাতিকে জানতে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে তিনি বীররসে সিক্ত করেছিলেন, ভারতীয় ঐতিহ্যের উৎকর্ষতা ও সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিশ্বের দরবারে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশন জনসেবায় অক্লান্ত, তাঁর অনুসারী নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসীরা গড়ে তুলেছিলেন এক উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধ শতবার্ষিকীতে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

একমাত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুলনা চলে। এমন সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কোন মনীষির মধ্যে দেখা যায়নি। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কথাই বলছি। তাঁর অনবদ্য দু'টি কীর্তির একটি হল বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যালস্ কোম্পানির পত্তন ঘটানো। যেখানে বাঙালি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের মস্তিষ্কের সফল প্রয়োগে গোলামি ছেড়ে স্বাধীন উদ্যোগে উদ্যোগপতি হয়ে শ্রমদানে দেশের সেবায় ব্রতী হয়ে উঠবে। এই উদ্যোগে তিনি যে বাঙালিকে বাণিজ্যে উৎসাহী হতে পথ দেখিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় অবদান বা কীর্তি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি গঠন। যার প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন স্বয়ং প্রফুল্ল চন্দ্র, ছাত্রদের

পীড়াপীড়িতে ও অনুরোধে। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৪ সালে। এখানে যে গবেষণা হত তা বিদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণার পাক্ষিক সায়েন্স, নেচার সহ আমেরিকার বিজ্ঞান জার্নালেও প্রকাশিত হত।

অবিভক্ত বাংলার যশোরে জন্ম, কলকাতা ও বিলেতে উচ্চশিক্ষা এবং প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এ হিস্ট্রি অব্ হিন্দু কেমিস্ট্রি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। প্রথম খন্ড বেরোয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় খন্ড। ইংরেজীতে ১২ টি ও বাংলাভাষায় ২২টি বই লিখেছেন। এছাড়া অসংখ্য সাময়িকীতে বিজ্ঞান সাধনার কীর্তি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, সাক্ষাতে আলোচনা করেছেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের সংকল্পে। এরকম এক বিজ্ঞানী যিনি পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মেও সৃষ্টির জগতে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বই স্থাপন করেন নি, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে দিশা দান করেছেন, তাঁদের স্বাবলম্বী হতে সর্বোতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর জন্ম সার্ধশতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

ডা: কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

ব্রিটিশ পদধৌত অনুপস্থিত জমিদারীর মুনাফায় বদ্ধজলার মত কূপমন্ডুক পুরুষতান্ত্রিক বাবু কালচারে কলকাতার নাগরিক সমাজ যখন আচ্ছন্ন তখন সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে বৃহৎ সংসার ও সন্তানদের সামলে এই মহীয়সী প্রতিভাধর নারী এশিয়ায় উপনিবেশ সৃষ্ট প্রথম মেডিকেল কলেজে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ত্বের জন্য ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবিচারের দরুণ শংসাপত্র থেকে বঞ্চিত হন। প্রথম মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতক হন ডা: বিধুমুখী বসু। এরপর ডা: গাঙ্গুলী ইংল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আরও উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। তারপর দেশে ফিরে দক্ষতার সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি নানাধরনের সমাজসেবামূলক, নারী উন্নয়ন ও জাতীয়তাবাদী কর্মকান্ডে যুক্ত থাকেন। তাঁর জন্মের সার্ধশতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দেবব্রত বিশ্বাস

ব্রাহ্ম সমাজের পরিবেশে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় বরিশাল ও ময়মনসিংহে কাটানো ছেলেবেলাতেই তিনি বর্ণহিন্দুদের কাছে ছিলেন অস্পৃশ্য। আর বলিষ্ঠ উদাত্ত সাবলীল কণ্ঠে নিজস্ব গায়কীর জন্য পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানের কাছে হয়ে উঠলেন ব্রাত্য। সহজ সরল দিলদরিয়া মনের মানুষ হলেও ছিলেন আপোষহীন ও দৃঢ়চেতা। নিজস্ব গায়কীতে বিখ্যাত "বাঁধ ভেঙ্গে দাও ..." গানটি গেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যেমন একসময় অচলায়তনের কুক্ষি থেকে বের করে এনেছিলেন, শেষ জীবনে ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত গেয়েছেন অবিচলিতভাবেই। অর্থনীতির স্নাতক জীবন বিমা কোম্পানীর চাকুরে অকৃতদার জনপ্রিয় জর্জদা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জন মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে স্বাধীনতা, যুদ্ধ বিরোধিতা এবং কৃষক ও গণ আন্দোলনের সমর্থনে যে 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে'র দলগুলি হাটে - মাঠে - রাজপথে গান গেয়ে বেড়াত জর্জ বিশ্বাস ছিলেন তাদের প্রাণপুরুষ। দেবব্রত বিশ্বাসের জন্ম শতবার্ষিকিতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

শ্রীহট্টের ধনী পরিবারের সন্তান হেমাঙ্গ বিশ্বাস 'সুনামগঞ্জের জালালী কবুতর' অথবা 'সুরমা নদীর গাংচিলে'র মত 'শূন্যে উড়া' দিয়ে গরীব মেহনতী কৃষক মজদুর আদিবাসী মানুষের সমাজজীবন পরিবর্তনের সংগ্রামে সামিল হলেন। জীবনের শেষদিন অবধি তাঁর লক্ষ্যে অবিচলিত থেকে কাটিয়ে দিলেন এক অনিশ্চিত অথচ স্মরণীয় জীবন। বাংলা ও অসমের লোকগান ও সুর নিয়ে তৈরি করলেন অজস্র জনপ্রিয় গণসঙ্গীত। তাঁর সেই অসাধারণ গানের ডালি নিয়ে দল বেঁধে গেয়ে চললেন বাংলা ও অসমের পথে প্রান্তে, কৃষক-আদিবাসী-ছাত্র-যুবদের আন্দোলনের আঙিনায় আঙিনায়। এর জন্য তাকে বহুবার জেল খাটতে, অত্যাচারিত ও অসুস্থ হতে হয়েছে। লোকগানের সুর ও বিষয় নিয়ে গানের মধ্যে দিয়েও তিনি আন্তর্জাতিকতার ও প্রলেতারিয় উপলব্ধি নিয়ে এসেছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই 'মাস সিঙ্গার'। অসংখ্য সাড়া জাগানো গানের মধ্যে 'স্বাধীনতা'কে ব্যঙ্গ করে গাওয়া 'মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গল কাব্য', যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদের গান 'শঙ্খচিল' কিংবা নৌ বিদ্রোহের উপর 'কল্লোল' নাটকের গান স্মরণীয়। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

বিখ্যাত 'মধুবংশীরগলি' কবিতার কবি এবং 'নবজীবনের গানে'র স্রষ্টাতেই পরিচয় যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল আরও ব্যাপ্ত। বিশিষ্ট কবি এবং রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা বটুকদা। পাবনার জমিদারের

আঙিনা ছেড়ে ক্ষুধাপীড়িত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজ পরিবর্তনের গান গেয়ে গেছেন। রসায়নে স্নাতক ও ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করে তিনি অনুশীলন সমিতি'তে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যোগ দেন। দীর্ঘদিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চ্চা করে 'গণনাট্য সংঘে' যোগ দিলেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের গান গাইতে। তিনি ছিলেন 'গণনাট্য সংঘে'র বিখ্যাত সঙ্গীত 'অর্কেস্ট্রা' দলের মূল স্থপতি ও সঞ্চালক। পরে সংগঠনে বিভাজন ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন। বোকারোয় ও দিল্লীর 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমিতে' শিক্ষকতা করেন। সেই সময় 'রাম চরিত মানস', 'তোতা কাহিনী', 'লম্বকর্ণ', 'আবোল তাবোল' প্রভৃতি ভারতীয় ধ্রুপদী লেখাগুলিতে সুর-সংযোগ করেন। সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে এবং ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ও 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রের তিনি সঙ্গীতপরিচালক ছিলেন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লোককবি নিবারণ পণ্ডিত

দশ বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হওয়ায় দারিদ্র্যের কারণে সপ্তম শ্রেণীর পর আর স্কুলে পড়তে পারেননি। বিড়ি বেঁধে অতি কষ্টে সংসার চালাতেন। কিন্তু ময়মনসিংহের এই স্বভাব কবির গান লেখায় কোন ক্লান্তি ছিল না। প্রেম ও ভক্তিরসের আঙ্গিকে গান লিখে সুর দিয়ে লোককবিদের দিয়ে দিতেন। অল্প বয়সে অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে ছড়া লিখে আক্রান্ত হন, গ্রামের কৃষকরা তাঁকে রক্ষা করেন। সেই থেকেই কৃষক আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে যোগদান। পাশাপাশি গান লেখার কাজ চলল। তাঁর গান বাঁধার ও পরিবেশনের পদ্ধতিটি ছিল অনন্য। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও লোক সুরে ও কথায় তিনি কৃষক সংগ্রামের পক্ষে এবং অত্যাচার, শোষণ, কালাকালুন, দাঙ্গা ও যুদ্ধ বিরোধিতা নিয়ে গান বাঁধতেন ও সপ্তাহান্তে গ্রামের হাটে গিয়ে কৃষকদের শোনাতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানী আক্রমনের সময় ব্রিটিশ ও জাপানী উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে জনপ্রিয় গান লিখে নিজের অবশিষ্ট জমি বিক্রি করে প্রায় দুলক্ষ কপি ছাপিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করেন। 'গণনাট্যে'র সাথে যুক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেরও অন্যতম সংগঠক হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭-র দেশ ভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক আন্দোলনের কাজে থেকে যান। মনি সিংহের নেতৃত্বাধীন হাজং ও গারো আদিবাসী কৃষকদের বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক হয়ে ওঠেন। ১৯৫০-এ কুখ্যাত 'আনসার' বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তারপর তিন বছর জেলের মধ্যে চলে অকথ্য অত্যাচার। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে পাকিস্তান সরকার তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। উদ্বাস্তু হয়ে ভগ্ন দেহ ও মনে কোচবিহারে এসে আমৃত্যু দারিদ্র্য ও অসুস্থতার সাথে ঘর করেন। কিন্তু তাঁর ছড়া ও গান রচনা বন্ধ হয়নি। পরিণত বয়সে রাজবংশী ভাষা রপ্ত করে গণআন্দোলনের সমর্থনে অজস্র মূল্যবান গান লিখে গেছেন। এর মধ্যে 'খাদ্যের দাবিতে মিছিলে গুলি চালনা', 'মিসা' ও 'সেনসার' বিরোধী ভাওয়াইয়া, পুঁথিপড়া ও টসার ঢঙে রচিত লোকগান তিনটি সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় তাঁর উপর আবার আক্রমণ হয়, এবারও সাধারণ কৃষকরা এই অসামান্য লোককবিকে রক্ষা করেন। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সাদাত হাসান মন্টো

ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয় নেতৃত্বের সৃষ্ট দেশভাগ ও দাঙ্গায় সাধারণ মানুষের করুণ পরিণতি নিয়ে অনুপম ব্যঙ্গ ও তীব্র শ্লেষে ভরা বিখ্যাত রচনা '**টোবা টেক সিং**' সহ অসংখ্য ছোটগল্প, চিত্রনাট্য প্রভৃতির রচয়িতা অমর কথাশিল্পী **সাদাত হাসান মন্টো** (১৯১২-১৯৫৫) উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক। অবিভক্ত ভারত ও পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্ম, অমৃতসর ও আলিগড়ে পড়াশুনা। স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরে আই.পি.টি.এ. -র সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়া। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'তামাসা' গল্প লেখা দিয়ে শুরু। লাহোরে অল্প সময় কাটিয়ে বম্বেতে থিতু হন। ওই সময় অসাধারণ সব গল্প এবং বম্বে ফিল্ম ইনডাস্ট্রির জন্য কালজয়ী সব চিত্রনাট্য লেখেন। মাঝখানে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' তে যুক্ত হন। দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানের লাহোরে চলে যান এবং সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সংবাদজগতের সংগে যুক্ত হন। পরবর্তিতে আর্থিক অনটনে পড়েন, অসুস্থ হয়ে যান ও তাঁর অকালে প্রয়াণ ঘটে। '**বু**', '**ধৌন**', '**খোল দো**', '**ঠান্ডা গোস্ত**' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গল্প। মন্টোকে স্বাধীনতার আগে তিনবার এবং পাকিস্তানে তিনবার অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়, কোনবারই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মূল্যবান লেখাগুলি বহুভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' দুই মহীয়সী স্বাধীনতা সংগ্রামী **প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার** এবং **মনিকুন্তলা সেনের** জন্মশতবার্ষিকীতে জানায় বিনম্র প্রণাম।
[গ্রন্থনা ঃ বাগদি ও সেন]

ভাষ্য

দারিদ্রের সংজ্ঞা বদল

দারিদ্র দূরীকরণ ভারতীয় রাষ্ট্রের এক পুরনো ঘোষিত কর্মসূচী এবং তাই নিয়ে সত্তর দশকের শুরু থেকে বিভিন্ন সরকার বিবিধ কর্মসূচী নিয়েছেন। দরিদ্র পরিবারগুলিকে ওই সমস্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করা হয়েছে। এরজন্য প্রয়োজন দারিদ্র সীমা (Poverty Line) নিরূপণ করা। সেইসময় বিশেষজ্ঞদের যে সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছিলেন তা হল আয়ের মুখ্য অংশ যেহেতু খাদ্য ক্রয়ে খরচ হয় সুতরাং পুষ্টিকে একটি সূচক হিসাবে ধরা হবে। দেখা গেল গড়ে গ্রামের লোকের প্রতিদিন প্রয়োজন ২৪০০ ক্যালরি এবং শহরের ক্ষেত্রে দৈনিক মাথা পিছু ২১০০ ক্যালরি। ২৪০০ টা পরে ২২০০ ক্যালরি করা হয়। ১৯৭৩ - ৭৪ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেল দৈনিক ২২০০ ও ২১০০ ক্যালরি সংস্থানের জন্য শহর ও গ্রামে মাথাপিছু দৈনিক ৪৯ ও ৫৬ টাকার প্রয়োজন। পরে সরকার নিযুক্ত সুরেশ তেণ্ডুলকার কমিশন ওই হিসাব নামিয়ে এনে দারিদ্রসীমা করলেন ২৮ ও ৩২ টাকা। বিশ্ব অর্থনীতিতে যা সাধারণভাবে বিবেচিত হয় এক ডলারের সীমা রেখায়। কিন্তু এতেও দেখা গেল, দেশের দারিদ্রের বহর সাংঘাতিক। সরকারি হিসেবে ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে ৩৪.৪৭ কোটি অর্থ্যাৎ জনসংখ্যার ২৯.৮%। এতো মনমোহন - মন্টেকদের নয়া উদার অর্থনীতিক সংস্কার কর্মসূচীর ব্যর্থতা ও অসারতা দেখিয়ে দিচ্ছে। তাহলে কি করা যায়? সত্যি সত্যি এই উপরি সৌধ লোক দেখানো পরিকল্পনাগুলি দিয়ে তো রাতারাতি ভারতের ব্যাপক দারিদ্র মোচন করা সম্ভব নয়, তাহলে এক কাজ করা যাক দারিদ্র সীমাটাই কমিয়ে দেওয়া যাক। অথচ এর মধ্যে আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটে গেছে। তাহলে খাতায় কলমে দারিদ্র কম দেখানো যাবে। যেরকম ভাবা তেমনি কাজ। যোজনা কমিশনের কর্মকর্তা মন্টেক সিংহের সুপারিশ মেনে মনমোহন সরকার ঘোষণা করলেন এবার থেকে দারিদ্র সীমা হবে গ্রামের ক্ষেত্রে ২২ টাকা ৪০ পয়সা এবং শহরের ক্ষেত্রে ২৮ টাকা ৬৫ পয়সা।

জনগণনায় অশনি সঙ্কেত

সেই প্রাচীন যুগ থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধিশীল, শান্তির নীড় ভারতীয় গ্রামগুলি বিদেশি পর্যটক, বণিক, ঐতিহাসিকদের আকর্ষণ ও চর্চ্চার বিষয়। ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজ জীবন নিয়ে গবেষণায় স্বয়ং কার্ল মার্কস ভারতীয় গ্রামগুলিকে 'অনন্য' বলেছিলেন। অন্যদিকে মধ্যযুগে মধ্য এশিয়া থেকে পাঠান - মোগল লুঠেরারা এসে স্থায়ী প্রায় ছয়'শ বছরের সুলতানী ও মোগল সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। চেয়েছিলেন ভারতীয় গ্রামগুলির স্বয়ং সম্পূর্ণতা ভেঙ্গে ফেলে নিজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করতে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি-সংস্কার করেও সফল হননি। এরপর এলেন ইংরেজ শাসকরা। তাদের দুশো বছরের কায়েমী শাসনে শোষণ ও লুণ্ঠন এক অন্যমাত্রা পেল। ভারতীয় সমৃদ্ধ গ্রামগুলি ছারখার হয়ে গেল, কিন্তু স্বয়ম্ভরতা হারাল না। তারপর যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার মাধ্যমে ভারতীয় শাসকরা এলেন। প্রথমে দুদশক নেহরুভিয়ান 'সমাজতান্ত্রিক' মডেল, তারপর এক দশক এককেন্দ্রিক ইন্দিরা 'সমাজতান্ত্রিক' মডেল, আগে পরে কয়েকবছর 'মিশ্র' জনতা মডেল, শেষমেষ নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্বায়ণের নয়া উদারনীতির মডেল। এত কিছুর পরও স্বাধীনতালাভের প্রথম ৫০ বছরে আমাদের গ্রামীণ স্বয়ম্ভরতা মোটামুটি অটুট থাকলেও শেষ দশকের নয়া উদারীকরণ কি আমাদের গ্রামগুলিকে বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিল? কিছু তথ্য দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে।

২০১১-র জনগণনা অনুসারে, ভারতের জন চিত্র (১০লক্ষে):

মোট জনসংখ্যা	গ্রামীন	গ্রামীন বৃদ্ধি	শহুরে	শহরে বৃদ্ধি	গ্রাম-শহরের বৃদ্ধির ব্যবধান
১,২১০.২	৮৩৩.১	৯০.৬	৩৭৭.১	৯১.০	-০.৪

দেখা যাচ্ছে গ্রামের থেকে শহরের জনসংখ্যা ১৯২১ ছাড়া গত ১১০ বছরের জনগণনায় এই প্রথম বাড়ল। এর মধ্যে ব্যাপক অভিবাসী ও অন্যান্য মানুষ নথিভুক্ত হননি। ১৯২১ এ ছিল ভয়াল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ২০০১ থেকে ২০১১ তে তেমন কিছু হয়নি। শিল্প ও অর্থনীতির এবং সুপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বিশাল কিছু উন্নতি হয়নি বরং এগুলি বিশ্ব বাজারের সাথে মন্দাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আসলে 'সবুজ বিপ্লব' থেকে 'নয়া উদারবাদী সংস্কার' ভুল নীতিগুলির ফলে আমাদের কৃষি ব্যাপক গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও পরিবেশ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে পাহাড়-নদী-জঙ্গল-আবহাওয়া ধ্বংসের মুখে পড়েছে। আমাদের স্বয়ম্ভর সমৃদ্ধ ছায়াসুনিবিড় গ্রামগুলি আজ উষর মরুপ্রায় অনাহারসর্বস্ব খণ্ডহর। গণনায় দেখা গেছে ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব মহারাষ্ট্র, প্রভৃতি রাজ্যের অসংখ্য গ্রামে শুধু বয়স্ক, শিশু ও মহিলারা রয়েছেন। কাজ, উপার্জন ও খাদ্যের আশায় কর্মক্ষম পুরুষেরা বিভিন্ন শহর ও শিল্পাঞ্চলে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে।

জাপানে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদায় ও কুডানকুলোম

এক চমৎকার দৃশ্য। ৫ মে ২০১২ শনিবার। জাপানের রাজধানী টোকিওর লক্ষ লক্ষ মানুষ পতাকা নাড়িয়ে শ্লোগান তুললেন, "বিদায়, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র।" সেদিন জাপানের শেষ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত পরমাণু চুল্লিটি অর্থাৎ টোমারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রর তৃতীয় ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হল। পৃথিবীর সবচাইতে প্রযুক্তি উন্নত দেশ জাপান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা-নাগাসাকির মার্কিন পরমাণু বোমার আক্রমণ থেকে গত বছরে ঘটা ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু কেন্দ্রে ১৮ মিটার সুনামির তাণ্ডবে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পেরেছে যে বালিশের নীচে বোমা নিয়ে ঘুমানো আদতে আত্মঘাতী। চেরনোবিলের পর রাশিয়া, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনার পর ফ্রান্স প্রমুখ পরমাণু শ্রেণির উন্নত দেশগুলি ক্রমশ পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে সরে এসে সৌরবিদ্যুৎ সহ অপ্রচলিত শক্তির দিকে ঝুঁকেছে। জার্মানিতো সৌর বিদ্যুতে অসম্ভব এগিয়েছে। ব্রাজিল এগিয়ে চলেছে ভেষজ মিথানল জ্বালানি উৎপাদন ও প্রস্তুতিতে। দানাশস্য থেকে মিথানল তৈরির বিষয়টি অবশ্যই বিতর্কিত। কেননা পরিবেশবিদরা বলছেন এভাবে মিথানল তৈরি করলে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগা দেশ ভারত। বিদেশি প্রভুদের নির্দেশে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক বস্তা পচা প্রযুক্তির অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক এক একটি পরমাণু প্রকল্প। মহারাষ্ট্রের জইতাপুরে গণপ্রতিরোধকে উপেক্ষা করে তৈরি হল পরমাণু কেন্দ্র। এরপর তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার উপকূলবর্তী সম্পন্ন কৃষক ও মৎস্যজীবী গ্রামগুলি ধ্বংস করে, ব্যাপক কৃষি জমি ও সমুদ্রের জলে মারাত্মক দূষণের সম্ভাবনা জাগিয়ে এবং সমস্ত গণ শুনানি ও গণপ্রতিরোধকে উপেক্ষা করে অথবা বলপূর্বক হটিয়ে দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কুডানকুলোম পরমাণুকেন্দ্রকে। এরপর হাত বাড়ানো হয়েছে অন্ধ্রের উত্তর সরকার উপকূল এলাকায়।

★ 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' মায়ানমারের গণতন্ত্রকামী আন্দোলনের নেত্রী আঙ সান সুকির দীর্ঘ অন্তরীন থেকে মুক্তিকে স্বাগত জানায়; মনিপুরের বীরাঙ্গনা ১২ বছর ধরে অনশন সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাওয়া ইরম শর্মিলা চানুর অবিলম্বে মুক্তি এবং 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' (আফস্পা) প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

★ 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' আন্না হাজারে, নাগরিক সমাজ এবং মহিলা সংগঠনগুলি কর্তৃক প্রস্তাবিত 'জনলোকপাল বিল', 'লোকায়ুক্ত', 'Right to Recall', সংসদে 'মহিলা সংরক্ষণ বিল' নিয়ে জন আন্দোলনকে সমর্থন জানায়; বিদেশি ব্যাঙ্কে রক্ষিত সমস্ত কালো টাকা ও বৃহৎ শিল্পপতিদের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের শোধ না দেওয়া ঋণ সুদ সমেত বাজেয়াপ্ত করার এবং অবিলম্বে সংসদ ও বিধানসভায় ৩৩% মহিলা আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়।

★ 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' Genetically Modified (GM) শস্য অনুমোদনের জন্য রচিত Biotechnology Regulatary Authority of India (BRAI) বিল প্রত্যাহার, বৃহৎ পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে পূর্ব ভারতকে উষর করে দেওয়ার কৌশলী চক্রান্ত 'সবুজ বিপ্লব' বন্ধের দাবিতে এবং বনাঞ্চল ও আদিবাসী গ্রাম ধ্বংস করে ব্যাপক হারে আকরিক উত্তোলনের বিরুদ্ধে 'গ্রীণ পীস' সহ পরিবেশ ও মানবিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনগুলিকে সমর্থন জানায়।

● ২০১২-র আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য দিবসের বিষয় ছিল 'স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য (Healthy Ageing)। WHO-র হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৮% জনসংখ্যার বয়স ৬০-র বেশি। ভারতে বয়স্করা ডায়াবেটিস, ক্যানসার, হৃৎপিণ্ডের অসুখ প্রভৃতিতে ভোগেন। এর সাথে মানসিক দুঃশ্চিন্তা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, একাকিত্ব তাদের গ্রাস করে। ভারত সরকার 'National Programme for Health Care for Elderly (NPHCE)'-র মাধ্যমে বয়স্কদের স্বাস্থ্য সমস্যা সুরাহা করতে চাইছেন।

● প্রতিবেশি শ্রীলঙ্কা সরকার ইতিমধ্যে বয়স্কদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য National Charters for Senior Citizens ও National Policy for Senior Citizens প্রবর্তন করেছেন। তাদের দেওয়া শংসাপত্র দেখিয়ে বয়স্করা সেখানে চিকিৎসা ও পরিবহনের বিশেষ সুযোগ পান। তাইল্যান্ডে 'Thai Older Persons Act' অনুযায়ী বয়স্করা স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সামাজিক সুরক্ষা, মাসিক ভাতা প্রভৃতির বিশেষ সুযোগ পান।

● WHO-র হিসাব অনুযায়ী ২০১১ এ ৬,৫৫,০০০ মানুষ ম্যালেরিয়া রোগে মারা যান। ২০১৫ কে লক্ষ্যমাত্রা ধরে ম্যালেরিয়া জনিত মৃত্যু রোধে বিশ্বজুড়ে *Plasmodium falciparum* জীবাণু বধের জন্য Artemisinin Combination Therapy (ACT) ব্যবহার করা হয়। অতীতে যেমন কার্যকরী ওষুধ Chloroquine এবং Sulfadaxine - pyremethamine প্রতিরোধ (resistance) দেখা গিয়েছিল অনুরূপভাবে পশ্চিম কম্বোডিয়া থেকে থাইল্যান্ড মায়ানমার সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে Artemisinin প্রতিরোধ দেখা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাই উদ্বিগ্ন।